।। ভূমিকা ।।

সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি জীবনের একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকে এবং লেখকের ব্যক্তি-জীবনেরও সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার একটা যোগ থাকে। এই পারিপার্শ্বিকতার মূল উপাদান হচ্ছে, পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোন লেখকের যে মানসিকতার কথা আমরা কখনো বলে থাকি, সেই মানসিকতা গড়ে ওঠে জীবনের এই উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে। বস্তুত একজন লেখক জীবতাবস্থায় যুগপৎ তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, যুগ পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সেইসূত্রে তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী অর্জন করেন। এ কথা, পৃথিবীর যে কোন লেখক সম্পর্কে, এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সাধারণত দেখা যায় দেশ, জাতি ও কালের প্রভাব কোন না কোন-ভাবে কবিমানস বা সাহিত্যিক মানস-গঠনে সাহায্য করে। যে দেশে কবি বা সাহিত্যিক জন্মেছেন, তার প্রাকৃতিক ও সহজাত প্রবণতা, যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মেছেন তার ভাবাদর্শ, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা, যে কালে তিনি জন্মেছেন তার সাধারণ ভাব-ধারা, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাঁর মানস-যন্ত্রে ঢালাই হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে, তাই প্রধানত ব্যক্ত হয় তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে। দেশ ও জাতির ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শ যখন একটা বিশেষ কালোপযোগী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখনি আমরা সেই ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শের যুগ-রূপকে প্রত্যক্ষ করি। এই যুগ রূপের প্রভাব বা যুগ প্রভাব অনেক কবিই এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেই সব কবিদের বলা হয় যুগ প্রতিনিধি-কবি বা যুগ কবি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় দুটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল। একটি মধুসূদন, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্র। মধুসূদন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাবে জীবনে ও তাঁর কাব্যে ছিলেন ঘোরতর বিদ্রোহী। পাশ্চাত্য ভাবের স্রোতে তিনি বাঙালীর ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, আচার-ব্যবহার-সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যখন তাঁর অন্তর্জীবন ব্যক্ত হ'ল, তাঁর অবচেতন মন প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল যে প্রচলিত কাব্য সংস্কার তিনি চূর্ণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর জন্মগত ও জাতিগত সংস্কার একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি। যুগধর্মকে স্বীকার করে পাশ্চাত্য-

ভাবের দ্বারা বাংলা কাব্যের একটা নূতন রূপ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও ভাবাদর্শকে ভুলতে পারেন নি। যে 'মেঘনাদবধ' তাঁর শ্রেষ্ঠ-কীর্তি, সেই কাব্যে পাশ্চাত্য কবিদের কত প্রভাব-প্রাচীন গ্রীক-রোমানের নয়া 'টোগা' আর ইংরেজের কোট-প্যাণ্টে প্রায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যখন সরমা সিঁদুরের কৌটা হাতে করে এসে সীতাকে বলল —'এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ', তখনই বাঙালী-বধূর লালপেড়ে শাড়ি আর লাল শাঁখা বেরিয়ে পড়ল। হিমালয়ের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, স্বর্গ মর্ত বিজয়ী যে রাবণ, তার মনিমাণিক্য খচিত রাজবেশের মধ্য থেকেও ভাগ্য-বিড়ম্বিত, শোক তাপগ্রস্ত, স্নেহ-কোমল হৃদয় একটি বাঙালী ভদ্রলোকের ধুতি-চাদর ঈষৎ চোখে পড়ে। কবি বীরবসের মহাকাব্য লিখতে বসে হৃদয়বান, ভাবপ্রবণ বাঙালীর করুণরসাত্মক মহাগীতিকাব্য লিখেছেন বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রভাবকে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা ও বাঙালীর আদর্শবাদের সঙ্গে মিশে এক অভিনব সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্য-সম্ভার বাঙালীর সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য ছিল-বাঙালীর ভাব-চিন্তা-কল্পনা রুচিকে বৃহত্তর করা, মহত্তর করা, বাঙালীর প্রাণকে নব অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা—নূতন সাহিত্য-চেতনা ও ভাব-সাধনায় তাকে নূতন স্বর্গে জন্মদান করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজি সভ্যতার স্রোতে বাঙালী তার সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলতে বসেছিল — তার আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব-সাধনা থেকে সে বিচ্যুত হয়েছিল। বঙ্কিম সেই আত্ম-বিস্মৃত জাতির সম্মুখে বাংলার আত্মা ও তার ভাব-সাধনাকে উজ্জ্বল রঙে তুলে ধরেছিলেন-জাতি সেই বিস্মৃত মূর্তি আবার দেখতে পেয়েছিল। তারপর তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম অবতারণা করেছিলেন রোমান্সের। বঙ্কিমচন্দ্র একটা অতি গভীর আবেগময় দেশাত্মবোধের সূত্রে ধর্ম ও সমাজকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। এই গভীর, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধই ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার উৎস। এই দুই প্রতিভার সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাঙালী জাতির ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও মানস সংস্কারের একটা যুগোপযোগী রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

এক-একটা যুগ বাইরের ঘটনা বা অভ্য-তরীন -সামাজিক পরিস্থিতি জাতির চলমান ভাব, চি-তা ও সংস্কারের ধারাকে এক-একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দান করে। সেই যুগের কবিদের কাব্যে কম-বেশি সেই বৈশিষ্ট্যের রূপ ও চিহ্নগুলি প্রতিফলিত হয়। এঁরাই যুগ-প্রতিনিধি কবি। আমাদের বাংলা সাহিত্যে আরো দুই-একজন কবিকে এইরূপ বলা হয়। কবি মুকু-দরাম ও ভারতচ-দ্র।

ইংরেজি সাহিত্যে আমরা চসার, পোপ ও টেনিসন কে এই জাতীয় যুগ-প্রতিনিধি কবি বলতে পারি। চসারের কাব্যে ইউরোপের মধ্য যুগ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মধ্য যুগের একটা বড় অনুষ্ঠান সিভাল্‌রি। এই প্রেম, যুদ্ধ ও ধর্মের অদ্ভুত সমন্বয় একদিন ইউরোপের কল্পনা ও রুচিকে গ্রাস করেছিল। চসারের কাব্যে তাঁর চিহ্ন বর্তমান। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজ-জীবনের ছবি তাঁর Canterbury Tales-এর ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। টেনিসনের কাব্যেও ভিকটোরীয়-যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও চি-তাধারার একটা ছাপ পড়েছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত টেনিসন কবিমানস।

রবী-দ্রনাথের প্রতিভা ভিন্ন শ্রেণীর। বিশ্বমুখিতা ও সার্বজনীনতা তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। দেশ, জাতি ও যুগের ঊর্ধ্বে যে সার্বজনীন ভাব, যে বিশ্বজনীন আদর্শ, যে চির-তন নীতি ও শাশ্বত সত্য, তারই উপর রবী-দ্রনাথের কাব্য-সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কার, যুক্তিহীন সমাজব্যবস্থার উপর রবী-দ্রনাথের অন্ধ ভক্তি ছিল না। মনুষ্যত্বের সার্বজনীন মহান আদর্শ ও উচ্চ নীতির কষ্টি-পাথরে তিনি দেশ ও জাতির ভাবাদর্শ ও সংস্কার-প্রথাকে বিচার করে গ্রহণ করেছেন। যুগপ্রভাব তাঁর কবিচিত্তে আঘাত করে অনুভূতি ও আবেগে রূপা-তরিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বটে, কোন কোন সময়ে, কি-তু ঐ যুগ-সমস্যার মধ্যে তাঁর কাব্যসৃষ্টি হয়নি। যুগের মধ্য দিয়ে যুগাতীত অবস্থায় উন্নীত হয়েছে এবং সর্বকালের সর্বমানবের সমস্যা রূপ পরিগ্রহ করেছে।

একদিন প্রথম স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে রবী-দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন, তাঁর কবি দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা ও শূন্যগর্ভ স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে জাতির অসংখ্য

দুর্বলতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল । স্বাধীনতা লাভ করা অর্থে তখনকার দিনের নেতারা বুঝেছিলেন , কোনক্রমে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা ; কি-তু রবী-দ্রনাথ বুঝেছিলেন, অ-তরাত্মার সর্বপ্রকার ব-ধন ও দাসত্ব মুক্তি-ই স্বাধীনতা । আমাদের আত্মশক্তি-ই বড় , ত্যাগ , তপস্যা ও কর্ম দিয়ে দেশকে নূতন করে সৃষ্টি করলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করব , দেশকে স্বদেশ বলে ফিরে পাব । কেবল 'বয়কট' ও ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারে স্বাধীনতা আসবে না , রাজদরবারে 'আবেদন -নিবেদনের থালা বহন' করলেও তা পাওয়া যাবে না । স্বাধীনতা নির্ভর করে অ-তরের মুক্তি-র উপর – মনুষ্যত্বের উদ্-বোধনের উপর – এটাই ছিল রবী-দ্রনাথের মত ।

প্রথম থেকে শেষ পর্য-ত রবী-দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহ অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, একা-ত আত্মমনের ভাবকল্পনার লীলাতেই তিনি বিভোর হয়েছিলেন । তাঁর পূর্বে রঙ্গলাল, হেমচ-দ্র , নবীনচ-দ্র দেশ প্রেমের উদ্দীপনায় কাব্য রচনা করেছিলেন । তরুণ এক কবির পক্ষে পূর্বগামীদের এই ভাবাদর্শকে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক ও লোভনীয় বটে । কি-তু কিশোর কবি তাঁর অপরিণত রচনা 'কবি-কাহিনী 'র মধ্যে খুব ঘটা করে বিশ্বপ্রেমের কথা প্রচার করেছেন । তারপর স-ধ্যাসঙ্গীত থেকে শেষ জীবনের কাব্যগুলই পর্য-ত রবী-দ্রনাথের বিচিত্র চি-তাধারা ও তার প্রকাশ ঘটেছে । কবি শেষ জীবনে একেবারে অধ্যাত্ম-সত্য-দ্রষ্টা ঋষিতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন । এর মধ্যে যুগ প্রভাব বা যুগ সমস্যা , বাংলা বা বাঙালী নীতির কোন বৈশিষ্ট্য , অথবা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি ।

এ একা-তভাবে তাঁর নিগূঢ় কবিমনের প্রতিচ্ছবি এবং এর অনুপ্রেরণা এসেছে এক অপার্থিব সৌ-দর্যানুভূতি থেকে , এক বিশ্বজনীন সত্যের রহস্য-উপলব্ধি থেকে , এক সার্বজনীন চি-তার ধ্যান থেকে । দেশ জাতি কালকে অতিক্রম করে তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বত সত্যের রূপকে তুলে ধরেছেন । বাংলার যুগ সমস্যাকে মূর্ত না করলেও বিশ্বমানব সমস্যার রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ।

এখন একটা প্রশ্ন থেকেই যায় , কবি অত সহজে দেশ কালের প্রভাব ও জাতি সংস্কার থেকে মুক্তি হয়ে , বাস্তবচেতনা , সমাজ-চেতনা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে সার্বজনীন ভাব সাধনায় , বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসরণে এবং অলৌকিক সৌ-দর্য ধ্যানে নিমগ্ন হলেন

মনে হয়, জীবনের প্রথম থেকেই কতকগুলি প্রভাব তাঁকে এমন স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং আত্মগত ভাব ও অনুভূতি-সর্বস্ব করেছে। প্রথম, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন, দ্বিতীয়, সমাজযুক্ত পরিবারের প্রভাব, তৃতীয় উপনিষদের শিক্ষালব্ধ অখণ্ড বিশ্ববোধ, অধ্যাত্ম-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মহিমার জ্ঞান; চতুর্থ বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব; পঞ্চম কবির গীতধর্মী প্রতিভা; ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবই হয় – প্রচলিত সংস্কার-বহুল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ। পূর্ব থেকেই পিরালী ঠাকুর পরিবার দেশের প্রচলিত সামাজিকতার আবেষ্টনী থেকে দূরে থেকে তাঁদের একটা নিজস্ব কালচার গড়ে তুলেছিলেন; তারপর দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনায় যখন সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করল, তখন সেই স্বাতন্ত্র্য আরো দৃঢ় হ'ল। তারপর দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষায় ও সাহচর্যে, উপনিষদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আত্মার অনন্ত স্বাধীনতা, জীবনের প্রথম থেকেই এমন দৃঢ়ভাবে কবিচিত্তে মুদ্রিত হয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে কবি দেশকালের সমস্ত সংস্কার-বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীন, মুক্ত প্রকাশকেই কবি-কর্মের বিষয় করলেন।

এই প্রভাবগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবি-মানস-গঠনে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। কিন্তু সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাব বর্জিত, জাতি - সমাজ - কালের সর্বপ্রকার সংস্কার – রীতি – বন্ধনহীন যে অনন্য সাধারণ মুক্ত কবিমানস আমরা লক্ষ্য করি – তার মূলে রয়েছে উপনিষদের মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে 'পত্রপুট কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখ করা যায়।

সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর ভাব, রস, রুচি, ভঙ্গী ও বাক্য রীতি সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর উপর প্রভাব বিস্তার করায় তাদের মন ও হৃদয় নূতনভাবে গড়ে উঠেছে। পূর্বের তুলনায় তারা এক নূতন যুগে বাস করছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিত্তজগৎ বহু প্রসারিত হয়েছে, ভাব প্রকাশের বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা এসেছে, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের ভিতর থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা গেছে এবং মানব চিত্তের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বাণী প্রচারিত হয়েছে। তাঁকে ঘিরে কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারুশিল্পের এক নূতন ধারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের আচার-ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, বসন-ভূষণে, গৃহে, সভা-বৈঠকে সর্বত্রই যেন একটা নূতন পরিমণ্ডল পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ যুগ প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের যুগ।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের পরিবার তখন বৃহৎ ছিল। বাড়িটা মস্ত বড়ো, তবু সকলকে ধরত না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময় একবার নাকি আমাদের বাড়িতে আলোচনা হয় তাঁর পরিবারে সংখ্যা কত। দাদাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল তাঁর পরিবার বড়ো না আমাদের পরিবার বড়ো। বলুদাদা কাগজ কলম নিয়ে দুই পরিবারের সংখ্যা গুণতি করে মহা-উল্লাসে সবাইকে জানালেন মহারানীর পরিবার সংখ্যা টেনেটুনে মাত্র এক শত। মহর্ষির পরিবারের শতাধিক আত্মীয়-স্বজন এই একখানা বাড়িতেই বাস করছে। মহর্ষির কাছে ভিক্টোরিয়া হেরে গেলেন"। এমন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। আরো উল্লেখ করা যায়, "পরিবারের কর্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রভাব পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। অথচ তিনি থাকতেন না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে। আর তাঁর কাছে থাকতেন তাঁর প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। যদিও বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোও তাঁর আদেশ মতোই চলত — কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই নির্দেশের অভাবে কোনো শৈথিল্য নেই। তিনি আমাদের দৃষ্টি গোচর ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর প্রভাব অনুভব করত। তাঁর আদর্শ সমস্ত পরিবারকে এমন অভিভূত করে রেখেছিল যে স্পষ্ট ভাবে কোনো আদেশ দিতে হত না।..... জোড়াসাঁকোর যে বাড়িতে আমরা, মহর্ষির নিজ পরিবার, থাকতুম, সেটা ছিল দ্বারকানাথ অন্দর মহল। নিজের জন্য পাশেই আর একটা বাড়ি করে ছিলেন —সেটা তাঁর বৈঠকখানা সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় এই ৫ নম্বর বাড়িটা গগন দাদাদের ভাগে পড়ে। গগন দাদা, সমরদাদা ও অবন দাদা তিন ভাই মিলে এই বাড়িতে থাকতেন।......তাঁদের মন ছিল পড়াশুনা ও শিল্পকলার চর্চায়। তাঁদের কাছে যেমন আসতেন কলকাতার ধনী — সম্প্রদায়, তেমনি আসতেন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা।" —— বাল্যকাল থেকে তাঁরা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন — মহর্ষির ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ, দ্বিজেন্দ্রনাথের একাধারে পাণ্ডিত্য ও সরলতা, সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কার মুক্ত আধুনিকতা ও গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ির শিল্প চর্চার আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়, ঠাকুর পরিবারে গানবাজনার পরিবেশের কথা জানা যায়।

কবির বিচিত্র জীবনপর্বে পুত্রের পারিবারিক বর্ণনার কথা লক্ষ্য করা গেছে। এই পারিবারিক পরিবেশ তাঁর ব্যক্তি-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্য কবির জীবনধারায় পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিয়েছে।

সামাজিক পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা রবী-দ্রনাথের জীবনে অনেকখানি প্রভাব ফেলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেছে, রেনেসাঁসের প্রভাব আমাদের দেশের মাটিকে স্পর্শ করেছে। ঐ সময়ে দুই মহাদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ গতি ছিল। যাতায়াত সহজ হয়ে এসেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময় শুধু ঘটেনি, সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা বিনিময়ের সূত্রও দেখা গেছে। তৎকালীন ভারতীয় মনীষিগণ নতুন সভ্যতার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের আচার আচরণকে দেশবাসীর অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পাড়ি দিয়ে অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর 'সতীদাহ' প্রথার সংস্কার নতুন যুগের সূচনা করেছিল। বর্তমান কাল তা ছুঁয়ে আছে। আরো একজন বাঙালী সমাজ সংস্কারকের নাম এই মুহূর্তে উল্লেখনীয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের পরিচয় সর্বজন বিদিত। তাছাড়া তাঁর 'বিধবা বিবাহ' প্রথাকে অস্বীকার করা যায় না। এই দুই সমাজ-সংস্কারক বহুবিধ অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালকে অতিক্রম করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনীষিগণের সুপরিকল্পিত চিন্তাধারা, অধ্যবসায়, শিক্ষা, দেশপ্রেম এবং সামাজিক কর্তব্যবোধকে স্মরণ করা যেতে পারে। রবী-দ্রনাথ এই পরিমন্ডলের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। ফলত তাঁর সুদূর প্রসারী সামাজিক রীতিনীতি বোধ বাঙালী তথা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতার লক্ষণ দেখা গেছে। তাঁর অমোঘ ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ যুগের সূচনা করেছে। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ধর্মীয় পরিবেশের একটা যোগসূত্র বিদ্যমান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা কবিকে খুবই উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তার প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামী মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি ক'রে। সংস্কারমুক্ত রবী-দ্রনাথ। তিনি তাই চেয়েছিলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কারের বোঝা ফেলে দিয়ে নতুন আলোর দিকে এগিয়ে আসুক। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার মূলেই তো সেই শিক্ষা। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের সাদৃশ্য অনেকে

খুঁজে পেয়েছেন । আসলে দেখা যাবে , ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই নামান্তর । একটি বিশেষ নতুন সমাজের আহ্বানে বাংলা তথা ভারতের প্রাণ পুরুষের একটি পদক্ষেপ । একটা জাতিকে গড়েপিটে তৈরী করার জন্যই তাঁর এই ধর্মের প্রবর্তন । তৎকালীন ইংরেজ শাসিত সমাজে এমন একটিবলিষ্ঠ চিন্তার স্বাক্ষর রাখা , একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল ।

সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ ছাড়াও প্রকৃতি-পরিবেশ কবির জীবনাবর্তে লক্ষ্য করেছি । তাঁর শৈশব কেটেছে ভৃত্য পরিবৃত । জমিদার বাড়ির বাইরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ ঘটে নি । কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন , "বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক , বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল । উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে , সে কেবলই বাহিরের উপরিই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে ; ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর । শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই । তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ , কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই । সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায় ।"[১]

তাঁর কথায় আরো আসা যায় , "ছেলে বেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে , তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ । সর্বত্রই একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই , এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত । প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত , "কী আছে বলো দেখি ।" কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না ।"[২] প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । ছেলেবেলায় ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের অধীন থেকে প্রকৃতি-পরিবেশ হতে দূরে মহানগরীর বহু প্রাচীর বেষ্টিত কক্ষমধ্যে নিরন্তর অবস্থান করায় , কবির মনে প্রকৃতির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মেছিল । তারপর বিহারীলালের কাব্য পড়ে সেই আকর্ষণ অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছিল । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য ,২১—২৪ পৃ:) বলেছেন , —

"এই (বিহারীলালের) বর্ণনা পাঠ করে বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত ....সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক-পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল ....যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিয়া থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।" "যে সোনার কাঠির স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে"-রবীন্দ্রনাথ সেই সোনার কাঠির স্পর্শে প্রথম লাভ করেন বিহারীলালের প্রকৃতি-বর্ণনায়। তারপর উপনিষদের প্রভাবে কবির প্রকৃতি প্রেম গভীর ও বৃহৎ হ'ল এবং প্রকৃতিকে কবি নবতর দৃষ্টিতে দেখলেন। একই প্রাণের ধারা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায়, কবি প্রকৃতির সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ অনুভব করলেন এবং তার সমস্ত রূপ ও রসে পরম সৌন্দর্যময় ও পরম রসময়কে আস্বাদন করলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সর্বব্যাপক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ প্রকৃতির কবি বিশ্বসাহিত্যে বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও প্রকৃতি তাঁর কাছে পুরানো হয় নি, সর্বদাই তাঁর চোখে প্রকৃতি অপূর্ব নবীন, রহস্যময়, বিস্ময় ঘন ও বিচিত্র রসমণ্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে স্থির সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও প্রকৃতির উপর থেকে কোনদিনই তাঁর মায়াময়, রহস্য মাখা রোমান্টিক দৃষ্টি একেবারে অপসারিত হয়নি দেখা যায়। প্রকৃতি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তিলে তিলে নূতন হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যে যে বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে গূঢ়তম রহস্য-চেতনা, মানব-মহিমার জয়গান, সার্বজনীন ভাব ও আদর্শপ্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যধ্যান লক্ষ্য করা যায়, তার উদ্ভব হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি থেকে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপ। এই অনুভূতি কেমন করে কবি মানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

সকলের চোখের আড়ালে যে কষ্টি পাথরের উপর স্থাপত্য শিল্পের চরম-উৎকর্ষ নিদর্শন স্বরূপ এই বিরাট, বিস্ময়কর রবীন্দ্রসাহিত্য-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত আছে, তার বড় পাথরটি হ'ল উপনিষদের শিক্ষা-ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ বাণী। যত বিচিত্র এর রূপ হোক, যত বিশাল এর অবয়ব হোক, এর ভাবকেন্দ্রকে রক্ষা করছে এই

নিভৃত তলদেশের পাথরখানি । গাছ যেমন সকলের অলক্ষ্যে বাতাস থেকে প্রাণবায়ু ও মাটির নীচে শিকড় থেকে রস টেনে নিয়ে বেড়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসও সেইরূপ উপনিষদের রস ও বায়ুতে বেড়ে উঠেছে । উপনিষদই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বহুল পরিমাণে গড়ে তুলেছে ও একটা বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টির অধিকারী করেছে । উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদের তত্ত্ব ও লীলাবাদ, হেগেলের Ideal Realism মতবাদ, বার্গসঁর গতিতত্ত্ব ও কবীর প্রভৃতি মরমী সাধু সন্তগণের আধ্যাত্মিকরসমূলক কবিতার প্রভাব কিছু পরিমাণে পড়ে কবি-মানস গঠনে সহায়তা করেছে । কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রভাব অর্থে একটা প্রবণতার সংকেত মাত্র — ভাব সাদৃশ্য মাত্র । রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি, তাঁর একান্ত নিজস্ব ও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি, তাঁরই কবি মানসের বিশেষ ধাতুর নির্মাণ ।

বিশ্ব প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের পরস্পর সম্বন্ধ উপনিষদের ঋষি যে ভাবে অনুভব করেছেন, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিও তাই হয়েছে । "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", 'ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—এ কো দেব : সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাস : সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মের ব্যাপ্তি, তাঁ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ও তাঁতেই বিলীন হচ্ছে । এক ব্রহ্ম পূর্বে ছিলেন, তিনি বহু হয়ে প্রজা সৃষ্টি করলেন । নিজে তপস্যা দিয়ে তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি তাঁর, তিনি সর্বময় । তাঁর স্বরূপ — "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম'। বিশেষ করে তাঁর স্বরূপ আনন্দময় — 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ - আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি । আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তীতি'। আনন্দই ব্রহ্ম - আনন্দ থেকে বিশ্বসৃষ্টি । 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। সৃষ্টিতে যা কিছু প্রকাশিত, তাই আনন্দের অমৃতরূপ । ভগবান অদ্বিতীয়, অনন্ত, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশেষ করে আনন্দ-স্বরূপ ও রসস্বরূপ । এই বিশ্ব তাঁরই ব্যাপ্তি - তাঁরই আনন্দময় সত্তার অভিব্যক্তি । সৃষ্টির সমস্ত কিছুই সেই মহান আনন্দের অমৃতরূপ । সুতরাং ভগবান, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কোন মূল প্রভেদ নেই — এক অনন্ত জ্ঞানময়, আনন্দময় ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তি । কবির রাজ্য জ্ঞানের রাজ্য নয়, বোধের রাজ্য নয় —

কেবলমাত্র অনুভূতির রাজ্য। উপনিষদের এই তত্ত্বকে কবি অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এই তত্ত্বানুভূতিই কবির সমস্ত কাব্য সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই প্রকৃতি, মানব-জীবন ও জগৎ প্রেম নিয়েই তাঁর কাব্যের সমস্ত কারবার চলেছে। তাঁর কাব্যে এই তিনটি ধারার মহানদী লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্ব প্রকৃতির কথায় এলে, দেখা যাবে রবী-দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি বিশ্বপ্রাণের দ্বারা প্রাণবান। সৃষ্টির প্রথমে এক আদি প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাস এই সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়েছিল। তখন মানুষ ও প্রকৃতিতে কোন ভেদ ছিল না। এমন মানুষ ও প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করলেও ওদের মধ্যে সমপ্রাণতা আছে, কারণ ওরা একই প্রাণের ভিন্ন রূপাভিব্যক্তি। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের প্রাণের নিবিড়, সম্পর্ক স্বাভাবিক; এটা মূল প্রাণের ঐক্যের যোগ। কবি তাই অত সহজে এই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করেছেন। তিনি সৃষ্টির আদিম প্রভাতে জল হয়ে, উদ্ভিদ হয়ে, পৃথিবীর সঙ্গে একদিন মিশে ছিলেন এবং ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে বর্তমানে মানব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, এই অনুভূতি কবির নিকট প্রবল এবং অনেক কবিতায় তা ব্যক্ত হয়েছে। তারপর বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপকে কবি নিত্য আনন্দের অমৃতরূপ বলে অনুভব করেছেন। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তাও সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ তারই ব্যক্তরূপ।

প্রকৃতির রূপ-রস-গান তিনি যেমন উপভোগ করেছেন, তার অলৌকিকত্ব অনন্তত্ব ও অসীমত্বও তার অঙ্গে সেইরূপই উপভোগ করেছেন। এই অসীম ও অনন্ত অংশের অনুভূতি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরূপে তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে ও তা চিরন্তন আনন্দের অমৃতরূপ বলে তাঁর নিকট প্রতিভাত হয়েছে। খণ্ডরূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করছে চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়। এইভাবে তিনি অখণ্ডের ভূমিকায় খণ্ড রূপ-রস গ্রহণ করেছেন।

রবী-দ্রনাথ মানবের কথা বলেছেন। মানবকেও তিনি এক অখণ্ড সত্যের অংশ স্বরূপ দেখিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানব সৃষ্টির অংশীভূত হওয়ায় তার মধ্য দিয়ে অখণ্ড ও অনন্ত আত্মপ্রকাশ করছেন। মানুষের উন্নত বোধের ভূমিতে, জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সর্বোচ্চ আদর্শের আলোক পরিধির মধ্যে অনন্ত সত্য-জ্ঞানময়, আনন্দময়ের প্রকাশ।

খন্ডের অসম্পূর্ণতা, দেশ কাল পাত্রের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যে সত্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্মুক্ত, উদার দৃষ্টি —মানুষের এই পরিপূর্ণ ও সমুন্নত চেতনার মধ্যে এই অনন্ত সত্য ও জ্ঞান প্রকটিত। এইখানেই খন্ডের মধ্যে অখন্ডের —জীবসংস্কারাবদ্ধ মানুষের মধ্যে চির-মানবের প্রকাশ। এখানে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ নেই, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিতের কোন সমস্যা নেই। দেশকালের দ্বারা খন্ডিত হলেও মানুষের মধ্যে এই অনন্ত জ্ঞান ও সত্যের বিহার ক্ষেত্রই, এই পরিপূর্ণ বোধের ক্ষেত্রই বিশ্বের সকল মানুষের মিলনস্থান। মানুষ যখন স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, ছোট-আমির সংস্কার ত্যাগ করে, চিন্তায়, কর্মে, প্রেমে সার্বজনীনতা ও বিশ্ব আত্মীয়তা দ্বারা একটা পরিপূর্ণতার সাধনা করে, তখনই যে প্রকৃত মানব-সত্তাকে অতিক্রম করে সেই মহান পুরুষকে অনুভব করে —জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করে। সাহিত্যের উপাদান মূলত তিনটি। প্রকৃতি, মানুষ এবং ঈশ্বর। এর মধ্যে প্রকৃতি এবং মানুষ দৃষ্টিগ্রাহ্য। ঈশ্বর অদৃশ্য। তাই প্রকৃতি আর মানুষ সীমার জগৎ এবং ঈশ্বর অসীমের জগৎ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব অনেকখানি। তাঁর সাহিত্যে এই নমুনা চোখে পড়ে। তাঁর জীবনবৃত্তে তিনটি পরিবেশের চিত্র দেখা যায়। জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতন। সমতল, মাঠ, নদী প্রভৃতি তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

তবে পাহাড়ও তাঁকে বার বার আকর্ষণ করেছে। শৈশব থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পাহাড় তাঁর আশ্রয় হয়েছে। শৈশবে তাঁর পাহাড়ের উপর আকর্ষণ জন্মাবার একটি কারণের কথা তুলে ধরা হল। 'জীবনস্মৃতি'তে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম —তাহারই মাঝে মাঝে ফুল গাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিত্য-তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।" পাহাড়কে ভালবাসার উদাহরণ অনেক আছে। এই প্রসঙ্গে ভানু সিংহের পত্রাবলী -১২ সংখ্যাটি উল্লেখ করি। তিনি লিখছেন: "তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্ছ।

আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলাম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময়টা মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ, —পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে"-এর বেশি আর নয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েচে, মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়। আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে বলে, ডাঙি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিসটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্তটা তো দেখতে পাইনে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি —এমন কি, যে মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাত জিনিসটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত, তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না, —বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঁচিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না — তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি —আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে; তিনি যে

আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয় আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো করে দেখা যায় না।'[৩]

পাহাড় পারিপার্শ্বিকতা রবী-দ্রনাথকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তাঁর জীবন এবং সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তাঁর রচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিবেশের মধ্যে অবস্থান কালে এবং পরিবেশের বাইরে থেকে প্রভাব পড়েছে। সুদূর মাদ্রাজে তিনি থেকেছেন। সেখান থেকে তাঁর রচনায় হিমালয়ের শৈলশহরের চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি বসবাস করেছেন একটি স্থানে, লিখেছেন অন্যস্থানের কথা। এটা বিশ্বকবির পক্ষে সম্ভব।

পাহাড় প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট স্থান রবী-দ্রনাথের সাহিত্যে আছে সত্য। তবে প্রকৃতির অনবদ্য হাতছানি অস্বীকার করা যায় না। পাহাড় প্রকৃতির পাশাপাশি প্রকৃতির অন্য অংশগুলি কবিকে কেমন ভাবে প্রভাবিত করেছে, তার একটা ছবি তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "রবী-দ্রনাথের জন্ম সেকালের কলিকাতা শহরে। সেকালের কলিকাতা অবশ্য একালের কলিকাতা নয় — তবু ঘনতম বসতির শহর, বাংলা দেশের তো বটেই, খুব সম্ভব ভারতেরও। এ হেন শহরের আবার ঘনতম বসতি অঞ্চলে তাঁহার জন্ম। শুধু তাহাই নয়, সেকালের মহর্ষিভবন পুত্রকন্যা জামাতা-দৌহিত্র আত্মীয়-স্বজন দাসদাসীতে পরিপূর্ণ বিরাট প্রাসাদ। এমন পরিবারে জাতকের মানুষের সঙ্গেই প্রথম পরিচয়; কালক্রমে সেই পরিচয় পাকা হইয়া উঠিবে, তাহার কলম মানুষের পদচিহ্নের পথটাই অনুসরণ করিতে শিখিবে —ইহাই তো প্রত্যাশিত। কি-তু ঠিক উল্টা ফল ফলিল। মানুষ ও ইমারত —অট্টালিকার নিষেধ ডিঙাইয়া দূরাগসারিত খণ্ডিত ছায়া-মূর্তি প্রকৃতির অমোঘ হাতছানি বালকের মনে আসিয়া প্রবেশ করিল।....প্রকৃতির নির্বাচ নামে দুটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, অধিক অগ্রসর হইবার আগে সাধ্যমতো তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লই। রবী-দ্রনাথ জন্মসূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এ আকর্ষণ দুর্জ্ঞেয় কেননা ইহার কারণ নির্দেশ সম্ভব নয়, ইহাই তাঁহার কবিশক্তি-র মূলধন। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বয়স ও অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূলধন স্ফীত হইয়া প্রচুর মুনাফা দেখাইয়াছে – তাহাই রবীন্দ্রসাহিত্যে। আবার বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই জন্মগত মূল আকর্ষণ ক্রমে নিবিড় পরিচয় ও অবশেষে গভীর জীবনতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। .... প্রকৃতি যে শিশুটিকে চিহ্নিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়া ছিল, মানুষের কোলে জন্মিয়া যে শিশু প্রকৃতিকে ভুলিয়া গেল না, মানুষের সতর্করচিত পাহারা এড়াইয়া দূরাবস্থিত প্রকৃতির মুখে আপন মাতৃমুখ দেখিয়া মুহূর্তে তাহাকে আপন বলিয়া চিনিয়া লইল।"[৪]

এখন একটা বিষয়ে একমত হওয়া গেল যে প্রকৃতির অন্তরমহলে প্রবেশ করার মূলে জীবনস্মৃতিতে তিনটি চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রকৃতির দূরাপহত অর্ধগুণ্ঠিত মূর্তি দর্শন, গঙ্গাতীরে পেনেটির বাগানে প্রকৃতির কোলের কাছে উপবেশন ও হিমালয়ে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিসর্জন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি লিখেছেন :

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার–জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ –মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখানে দূরে, বাহিরে এখনো বাহিরেই।"[৫] জীবনস্মৃতির 'বাহিরে যাত্রা'র কিছু অংশ তুলে ধরা হ'ল। "এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীর ভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটা কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়া তলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা-বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাবে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম।...প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার–ভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের

108465

4 SEP 1992

ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোনগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনা-ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্ত কালের অজস্র স্বর্ণশোণিত প্লাবন। ....কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জ-মলাভ করিলাম।"[৬]

এক প্রকৃতির নির্বাচন বলা সঙ্গত মনে হয়। এতদিন যে প্রকৃতি দেয়াল-ইমারতের "ফাঁক-ফুকর" দিয়ে মনে মনে দেখা দিয়ে বালককে মুগ্ধ করত, এবারে প্রথম সুযোগেই অবাধমূর্তিতে তার সম্মুখে এসে "অয়ম অহং ভো:" বলে সাড়া দিল। বালকও তাকে চিনল।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থ রচনার সময়ে কবি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের যোগাযোগের সূক্ষ্ম ও শিক্ষাপ্রদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য বলিয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পরে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনই এক নিমিষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল, সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশের মতো তখন তিনি প্রথম কলকাতার বাইরে গেলেন—পেনেটির বাগান বাড়িতে, খাঁচার পাখি দাঁড়ের উপরে বসিল। কবি লিখেছেন,[৮]

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব ।
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব ।"

কি-তু অভাবনীয় সুযোগে দাঁড়ের শিকলটাও খুলে গেল, সে পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা, পথে পড়ল সেকালের শান্তিনিকেতন :

"গাড়ি ছুটিয়া চলিল ; তরু শ্রেণীর সবুজ-নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে ।"[৯]

পাহাড়ের পারিপার্শ্বিকতা কবির জীবনে খুব প্রভাব ফেলেছিল । তার ইঙ্গিত 'হিমালয় যাত্রা' অংশে প্রতিভাত হয়েছে । এই অল্প বয়সেই কবির হিমালয়ে গিয়ে পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটেছিল, খাঁচার শলা দাঁড়ের শিকল দুইই ঘুচে গেছে, তবু দূর ও বাহির এতটুকুও কাছে আসল না ।

"যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে নীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথর গুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল কুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ।"[১০] রেলগাড়িতে বসিয়া আয়ত্তপ্রায় প্রকৃতিকে "মরীচিকার বন্যা" মনে হচ্ছিল আর এখানে করায়ত্ত প্রকৃতি মুহূর্তে অভ্যস্ত বেশ পরিবর্তন করে মানবরূপ ধারণ করল । ছিন্ন পত্রের যুগেও মানব ও প্রকৃতির এই লীলা বিনিময় দেখতে পাব, পদ্মা সেখানে মানবী ও বিশ্বপ্রকৃতি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে পরিণত হয়েছে ।

হিমালয় থেকে ফিরবার পরে বালকের অধিকারের সীমানা অনেকটা বেড়ে গেল, তবু সীমার শাসন ঘুচতে চায় না ।

"এমনি করিয়া তো দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে । বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি । সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত ।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'শিলাইদহে'র একটি বিশেষ স্থান আছে । তাঁর রচনায় ঘুরে ফিরে তার প্রভাব পড়েছে । নির্জন প্রকৃতির অখণ্ড অবদান স্মরণ করা যেতে পারে । পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তাঁদের পরিবারে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন । স্বাভাবিক সংকোচ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকেই যেতে হয়েছিল । এ ঘটনা ১৮৯১ সালের । ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে একরূপ স্থায়ীভাবে শিলাইদহে থাকতে হ'ল । উড়িষ্যায় তাঁদের যে সম্পত্তি ছিল তা দেখবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় সেখানে গেছেন - অনেক সময় তিনি কলকাতায় এসেছেন — কিন্তু এই দশ বছর কাল শিলাইদহ তাঁর স্থায়ী বাসস্থান ধরে নিলে অন্যায় হবে না । শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরকে তিনটি বিন্দু কল্পনা করে একটি ত্রিভুজ আঁকলে এটাই হ'ল তাঁর তিনকোণা পৃথিবী । মনে মনে কবি একে হয়ত নির্বাসন ভেবেছিলেন কিন্তু দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর স্বস্থানে আগমন । কবির অজান্তে অদৃষ্ট আর-এক নূতন লীলার আসর পত্তন হল । এটি যে কত বড় আর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই সাক্ষ্য বহন করছে । এখানকার পদ্মা নদী কবির প্রধান মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন হয়ে উঠল । কলকাতা বাসকালে গঙ্গা নদী (পেনেটির বাগান ও চন্দন নগর স্মরণীয়) যে মুক্তির স্বাদ দিত, বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য রাজ্যে বহন করে নিয়ে যেত, পদ্মা নদী তাই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে করতে থাকবে -এই হয়ত কবি ভেবেছিলেন । কিন্তু কার্যত উল্টা ফল ফলল ।

পদ্মার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

"পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলো এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না । আর, এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে —এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়া পেরিয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায় । কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে । সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ । পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ ঘেঁষা নদী—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কার্য প্রবাহগুলি বেশ সুন্দর ভাবে এসে মিশছে । সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব

নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে যেমনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাস শিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখে শুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আন হাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে –তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে যথাযোগ্য সখীত্ব করে আবার চলে যায়।"[১২]

শিলাইদহ গ্রাম্য জীবনের ছবির টুকরোগুলি একে একে কবির কল্পনার প্লেটের উপরে ছায়া নিক্ষেপ করতে থাকে। কখনো তিনি কুঠিবাড়ির ছোট ডাকঘরের প্রবাসী পোস্টমাস্টারকে দেখতে পান, তাকে কাছে ডেকে নিয়ে গল্প করেন, পোস্টমাস্টার গল্পের ভূমিকা রচিত হয়। কখন দেখেন যে একদল ছেলে নদীর তীরে একটা মাস্তুল গড়িয়ে খেলা করছে –"ছুটি" গল্পের উপাদান সংগ্রহ হয়। নদী তীরে বেদে -দলের জীবনযাপন দেখতে পান যখন, তখন জানেন না যে চৈতালির একটি কবিতার উপকরণ সংগৃহীত হ'ল।

প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, "বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি - খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদী স্রোত এবং নদী তীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়া বেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলেছে।"

"প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি" এবং "রৌদ্রবৃষ্টি নদী স্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়া বেষ্টিত গ্রাম" প্রকৃতির নিগূঢ় রসটি যে না পাবে তার কাছে গল্পগুলি সার্থক না মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে শিলাইদহ, পতিসর ও সাজাদপুর অবস্থান করেছেন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি তাঁকে বিমোহিত করেছে। এই তিনটি স্থান থেকে তিনি অনেকগুলি চিঠি লিখেছেন। ঐ চিঠিগুলিতে নিসর্গের প্রভাব কবির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বলা যেতে পারে । ছিন্ন পত্রাবলীর ২২১ সংখ্যক চিঠিটি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরি : "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে – আকাশ মেঘে অন্ধকার । গুরু গুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো বাতাসে তীরের বনঝাউগুলো আন্দোলিত হচ্ছে । বনের মধ্যে শেয়াল ডাকছে, নদীতে নৌকো নেই –মেয়েরা ঘাট পরিত্যাগ করেছে, ডাঙায় জনমানব নেই –শুটি দুই-তিন গোরু বাবলা-বনের ভিতর দিয়ে গৃহমুখে চলেছে । ডাঙায় বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে । আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি –উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে । এ দিকে নদীর চাঞ্চল্যে যে-একটু দোলা দিচ্ছে তাতেও লাইন ঠিক রেখে লেখা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে । কিন্তু এই ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে — এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে । এই গোধূলির মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি । কিন্তু সেটা একটা ইচ্ছা মাত্র—কী করলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় তা ঠিক জানি নে । অর্থাৎ চিঠিকে ঠিক সেই নির্জন ঘরের গল্পে পরিণত করার মতো ক্ষমতা নেই । আমাদের মনের খুব সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য । সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয় নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না । অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, কিন্তু গল্প জমানো সহজ নয় ।"[১৩]

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে । কবি জীবনের পট পরিবর্তন হয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে । একালের শান্তিনিকেতন দেখে সেকালের শান্তিনিকেতনের রূপ বুঝতে পারা সম্ভব নয় । একালের শান্তিনিকেতন বহু হর্ম্যরাজিসুশোভিত বৃহৎ জনপদ, সুরুলের শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ব্যবধান-স্বরূপ যে শূন্য প্রান্তর তা লোপ পেয়েছে, আবার বোলপুর শহরের সীমানা বাড়তে বাড়তে শান্তিনিকেতনের সীমানাকে স্পর্শ করেছে । তারপর আছে মানুষের রোপণ করা বহু রকমের উদ্ভিদ যার অধিকাংশই বনস্পতিরূপে জনপদটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । সেকালের ক্ষুদ্র পল্লী কল্পনায় আনতে হলে এসব ভুলতে হবে । গোটা দুই পাকা বাড়ী, খান কতক চালাঘর, এই তো মানুষের বাসস্থান । মানুষের সংখ্যাও কুড়ি-পঁচিশের বেশি হবে না । আর আজকার বড় বড় বৃক্ষরাজি সমস্তই ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল, কল্পনার মধ্যেও ছিল

কি না সন্দেহ। একটি শালগাছের শ্রেণী, ক্ষুদ্র একটি আম্রকুঞ্জ, কিছু তালগাছ — আর এই প্রান্তরের আদিমতম অধিবাসী দুটি ছাতিম বৃক্ষ, এই তো তৎকালীন উদ্ভিদ সম্পদ। এখন কবি জীবনের পূর্ববর্তী দুটি স্থানের সঙ্গে এর প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে মানুষের বিচিত্র রূপ ছিল কলকাতায়, প্রকৃতির বিচিত্ররূপ ছিল শিলাইদহে, এখানে মানুষ ও প্রকৃতি নূন্যতম স্থান অধিকার করে অসীম শূন্যতাকে আসন ছেড়ে দিয়েছে। মানুষের জগৎ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে কবি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছিলেন, প্রকৃতির জগৎ শিলাইদহে স্নানা-তরিত হয়ে তিনি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করলেন; এবারে তিনি এমন একস্থানে আসলেন যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির লীলা অপ্রকট।

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার সাহিত্য চিন্তার উৎস প্রকৃতি। তাঁর বিশ্বপ্রেম ও মানব প্রেমের ভিত্তিও সুগভীর প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যেই অনুসন্ধানযোগ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস করুণা থেকেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর প্রিয় চরিত্রগুলি (এখানে করুণা ও মহেন্দ্র) তাদের অনিঃশেষ দুঃখেও বেদনায় প্রকৃতির দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী এই জাতীয় চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের প্রিয় এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ বক্তব্য ও ভাবাদর্শের বাহন। বউঠাকুরানীর হাটের বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য ও বিভা সকলেরই সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিবিড়, কখনো সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে কখনো চরিত্র-চিত্রণের পদ্ধতিতে এই সম্বন্ধের নিবিড়তা পরিস্ফুট হয়। বসন্ত রায় চরিত্রের মধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের গভীরতা আভাসিত হচ্ছে। বস্তুত বসন্ত রায়ের সহজ, সরল, স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম স্বভাব থেকে এমন ধারণা সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয় যে, প্রকৃতির একটি দিকই তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছে। উদয়াদিত্যের প্রকৃতিপ্রীতি অসাধারণ, সুগভীর। প্রিয় চরিত্রগুলিকে প্রকৃতির হৃদয় থেকে রবীন্দ্রনাথ যেন আলাদা করে দেখাতেই কুণ্ঠা বোধ করেন। বস্তুত, রবীন্দ্র-ধারণায় প্রকৃতি থেকে স্খলিত মানব-অসম্পূর্ণ মানুষ, অস্বাভাবিক, অসুস্থ। রক্ত করবীর রাজা এই রকম একজন অসম্পূর্ণ মানুষ - প্রকৃতি থেকে তার স্বেচ্ছা নির্বাসনই তার অস্বাভাবিকতার কারণ। নন্দিনী প্রকৃতির চিরদূতী হয়ে তার সেই বস্তু সর্বস্ব জড়তাকঠিন আবরণের উপর প্রথম আঘাত হানলো। যা-ই হোক, বউঠাকুরানীর হাট থেকে দুটি মাত্র অংশ উদ্ধার করে প্রকৃতি সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের ধারণা এবং সেই সূত্রে উদয়াদিত্য চরিত্রে প্রকৃতির বিশেষ দান নির্ণয়ে সচেষ্ট হব।

উদয়াদিত্য এখন কারাগারে ব-দী । বিভা বহু কষ্টে কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে ভিতরে এসে দেখলো'...উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই । ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপর মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ।...বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল , "দাদা , মাটিতে বসিয়া কেন ? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে । দেখিয়া বোধ হইতেছে , একবারও তুমি খাটে বস নাই । এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ"? বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল ।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন , "খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা । জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি , তখন মনে হয় , আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে , আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অন-ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব । এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই , তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখি , তখন ভুলিয়া যাই যে আমার একদিন মুক্তি হইবে , একদিন নিষ্কৃতি হইবে –মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে , এ কারাগার হইতে একদিন খালাস পাইব । বিভা , এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে , আমি স্বভাবতই স্বাধীন ; কোনো রাজা–মহারাজা আমাকে ব-দী করিতে পারে না । আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা , ওইখানেই আমার কারাগার ।"[১৪]

আকাশ এখানে বিশ্বপ্রকৃতি , মুক্তির লীলাক্ষেত্র এবং স্বাধীন সৌন্দর্যময় জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে । রক্তকরবীতে নন্দিনী-বিশুর সংলাপে –গানে ওই 'আকাশ '-ই জেগে ওঠে যক্ষপুরীর শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যেও । নন্দিনী । শুনল ভাই , এই ব-ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার -আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে । বাকি আর সব বোজা ।

বিশু । সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি ।
ব-দীজীবনে উদয়াদিত্য এই এক টুকরো আকাশের মধ্যেই বিশ্বপ্রকৃতিও স্বাধীন জীবনচ্ছবিকে লাভ করেছে । আবার , সুরমার মৃত্যু ও ব-দীজীবনের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে বস-ত রায়ের সঙ্গে "বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন , কি-তু আগেকার মতো তেমন আন-দ আর পাইলেন না ।"

কি-তু কয়েকদিন কেটে গেল , বস-ত রায়ের সান্নিধ্য তো আছেই , তা ছাড়া

প্রকৃতির এই সাহচর্য —

"অনেকদিনের পর চারিদিকে গাছ পালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার—আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন।"[১৫]

মুক্ত প্রকৃতির মধ্য থেকেই লেখক সৃষ্টি হন। আর লেখকের হাতে গড়ে ওঠে এই জাতীয় চরিত্র সমূহের জীবনদর্শন এবং তা প্রকৃতির সাহচর্যেই পুষ্ট ও পরিণত হয়। রাজর্ষি উপন্যাসে গোবি-দময়ন্তিকা যখন স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করে নিলেন, তখন তাঁর বিদায় মুহূর্তে অকৃতজ্ঞ প্রজাদের কী নৃশংস আচরণের বর্ণনা আমরা পেয়েছি। কেবল একটি অতি সাধারণ প্রজার ভক্তি-প্রণত হৃদয় ছাড়া সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো, ঠিক ঐ মুহূর্তে, আর কিছুই তাঁর ছিল না। কিন্তু তারপর —

"ময়ানি নদীর ধারে মহারাজ কুটির বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছ সলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোটো বড়ো শিলা খণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে পাখি বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে, অনেক বিলম্বে সূর্যের দুই —একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। ... এই ছায়া, শীতল প্রবাহ, স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবি-দময়ন্তিকা বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন —নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল।"[১৬]

রাজর্ষি উপন্যাসের রাজা তাঁর রাজ্য থেকে কী ভাবে চলে এসেছিলেন, কোথায় এসে কোন্ সান্ত্বনায় তিনি শান্তি পেলেন, তা-ও দেখা গেল। এই প্রকৃতি ঘেরা জীবন তাঁর মধ্যে ক্রমশ এনে দিয়েছে শান্তি, উদার বিশ্বপ্রীতি, জাতি ধর্ম শত্রুমিত্র নির্বিশেষে এক অসাধারণ মানবপ্রীতি।

বউঠাকুরানীর হাটের যুবরাজ রাজ্যের উপর তাঁর সমস্ত দাবি ও অধিকার

পরিত্যাগ করে যেদিন যাত্রা করলেন –সেদিনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণেও রবী-দ্রমানসের প্রকৃতিভাবনা অনুরূপ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে, আর বোঝা গেছে সংকীর্ণ সংসার ও স্বদেশসীমার বাইরেও পৃথিবী ব্যাপ্ততর, চেতনা যেখানে পূর্ণতর, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানববোধ অর্জনের জন্য সংকীর্ণ সীমাকে অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই --

"শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল–জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্ত-পিপাসু কঠোর হৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্ত-লালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহময়তা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল।"[১৭]

সংকীর্ণ রাজ্যসীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর বিশ্বের প্রবেশদ্বারে এই স্বেচ্ছা নির্বাসিত যুবরাজকেও বরণ করে নিল কে ?

"তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা ঊর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাতমুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"

এইভাবে বিশ্বকবির বিভিন্ন রচনায় প্রকৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পাহাড় প্রকৃতি একটি বিশেষ রূপ বলে পরিগণিত। স্বতঃস্ফূর্তরূপে লেখায় তার প্রকাশ ঘটেছে। কখনো প্রত্যক্ষ, আকস্মিক এবং পরোক্ষ।

একটা কথা আমরা জানি, রবী-দ্রনাথ পিতা দেবে-দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। বিশেষ করে উল্লেখ্য, অধ্যাত্মচেতনা। পিতার সঙ্গে তিনি একবার হিমালয় যাত্রা করেছিলেন। ঐ ভ্রমণ কালে পিতা দেবে-দ্রনাথ একদিন

জ্যোৎস্নারাত্রে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটি বিশেষ শক্তি-বলে তিনি নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছিলেন। কবি তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর জীবনে এর প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনাতেও প্রকৃতির অপরূপ লীলা প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা বহুলাংশে অধ্যাত্মভাবনায় মুখর।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে অধ্যাত্মভাবনা যেমন আছে, তেমনি আছে উপনিষদের শিক্ষা। এই দুইটি খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী। উপনিষদের বাণী তাঁর অনেক রচনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে প্রতিভাত। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যো পনিষৎ এর সত্যকাম জাবালার কথায় আসা যাক। সত্যকাম জাবালা ঋষি গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্যাবাস করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে আচার্য্যরূপে গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ঋষি গৌতম তাঁর গোত্র পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। অবশেষে গুরু তাঁকে চারি শত ক্ষীণ ও দুর্বল গোধন চারণের জন্য বলেন। তবে একটি সর্ত ছিল, যতদিন না এরা সবল হয়, ততদিন প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। সত্যকাম সেই সর্ত মেনে প্রস্থান করেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় বৃষভ, অগ্নি, হংস এবং মদ্গু প্রমুখ দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করেন। যথাসময়ে গো চারিশত নিয়ে তিনি গৌতমের নিকট ফিরে আসেন। ঋষি গৌতম গোধন সমূহের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে জ্যোতি ফুটে উঠেছে। ঋষি তাঁকে বলছেন :

"ব্রহ্মবিৎ ইব বৈ সোম্য ভাসি কঃ নূত্বা অনুশ শাস ইতি অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ ইতি।"[১৮]

অর্থাৎ "হে সোম্য, তুমি ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কোন ব্যক্তি তোমায় উপদেশ দিয়াছেন।" প্রত্যুত্তর দিলেন, "মনুষ্যভিন্ন অপরেরা (উপদেশ দিয়াছেন)।"

সত্যকাম জাবালা আসলে নিসর্গের কাছে দীক্ষা পেয়ে জীবনধন্য করেছিলেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে সকলেই লালিত। ঋষি থেকে সাধারণ মানুষ এমন কি ঈশ্বর সৃষ্ট সকল জীবকুলও।

এই প্রসঙ্গে F.C.Happold তাঁর 'Mysticism A Study and an anthology' গ্রন্থে প্রকৃতির প্রভাব মানবজীবনের ক্ষেত্রে কত দূর প্রসারী তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি একাধিক ব্যক্তির কথা তুলে ধরেছেন। এরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে

পর্বত, টিলা বা নদীকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করেছেন নিজের কর্ম উপলক্ষে। প্রকৃতির অমোঘ হাতছানিতে আত্মস্থ হয়েছেন ধ্যানে। পার্থিব জগৎ থেকে অনেক দূরের চিন্তায় তাঁরা প্রত্যেকেই অধ্যাত্মভাবনায় বিভোর ছিলেন। নির্মল প্রকৃতি যে ভাবায় এবং অন্য-ভাবনায় উপনীত করে, তারই রহস্য লেখক দেখিয়েছেন। প্রকৃতি দৌত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। এক কথায়, এক রহস্যময় পথের সন্ধান দিয়েছেন। 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পার্বত্যভ্রমণের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ, ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। এই সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনার সূত্র ধরেই বলব। পৃথিবীর সব সাহিত্যে লেখক বা কবি জীবনের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব লক্ষ্য করেছি। স্পষ্টই লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন লেখক বা কবি নিসর্গ থেকে দূরে নেই। অথবা বলা যায়, নিসর্গ পারিপার্শ্বিকতা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পারিপার্শ্বিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পারিপার্শ্বিকতা বা পরিবেশের সঙ্গে একদিকে যেমন কবি-জীবনে বিশিষ্ট রূপটি গড়ে ওঠে, অন্য দিকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, কবি বা সাহিত্যিক যখন যে পরিবেশে বা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করেন তখন সেই বিশেষ পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা থেকে তাঁর কাব্য বা সাহিত্যের জন্ম হয়। এই কারণেই সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হিসাবে সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকতার প্রশ্নটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

একথা রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার উৎস কবির বিচিত্র জীবন। প্রকৃত-পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যাপন করেছেন এবং এক একটি পরিবেশের ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশেষ রচনা।

বর্তমান গবেষণায়, আমাদের প্রস্তাব এই যে, রবীন্দ্রনাথ বহুবার পার্বত্য-অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে এইসব জায়গায় বসবাস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিঙ, তিনধরিয়া, কার্সিয়াং, কালিম্পঙ, মংপু থেকে শুরু করে শিলঙ এমন কি সুদূর রামগড়, আলমোড়া, কাশ্মীর শ্রীনগর উপত্যকায় তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং এইসব জায়গায় বেশ কিছুকাল থেকেছেন। কবি সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরী প্রভৃতি ছোট বড় শৈলশহরে থেকেছেন। ঐ সকল স্থানে অবস্থানকালে তাঁর কোন উল্লেখ্য রচনা আলোচ্য বিষয়ে পাওয়া যায়নি। সেকারণ ঐ সকল স্থানের কোন আলোচনা সম্ভবপর হয়নি। রবীন্দ্রজীবনের দিকে তাকিয়ে এখন আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, কবির এইসব

পার্বত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে ।

প্রথম অধ্যায়ে রবী-দ্রজীবনে বিভিন্ন পার্বত্য জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় রবী-দ্রনাথ তাঁর সমগ্রজীবনে কিভাবে কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করেছেন, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা । রবী-দ্রজীবন থেকে জানা যায় যে, কৈশোর অবস্থাতেই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেন । পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, যমপু, তিনধরিয়া, শিলঙ, রামগড়, আলমোড়া, কাশ্মীর-শ্রীনগর প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন । তা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে, পাহাড়ে নির্জন বসবাস তাঁর পক্ষে খুবই প্রার্থিত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে এইসব পার্বত্যভ্রমণে বসবাসের সময় তিনি অসংখ্য লেখা লিখেছেন । এই কারণেই একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, এইসব বিশিষ্ট পার্বত্য পরিবেশের সঙ্গে সেইসব রচনার একটা যোগ থেকে গেছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দার্জিলিঙ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় কবির ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং এই সময় রচিত তাঁর বিভিন্ন রচনার পর্যালোচনা করা হয়েছে । শৈল শহরগুলিতে রবী-দ্রনাথ কিভাবে বসবাস করেছেন এবং ঐ সময়ে তাঁর রচনা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে -সে বিষয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রবী-দ্রনাথের শিলঙ ভ্রমণ এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে তার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে । একই ভাবে আমরা দেখেছি যে, শিলঙ অবস্থান কালে কবিকে পাহাড় পরিবেশ আপ্লুত করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ।

চতুর্থ অধ্যায়ে রবী-দ্রনাথের আলমোড়া ও রামগড় ভ্রমণ এবং তাঁর সাহিত্যে ঐ সকল স্থানের প্রভাব কতখানি তা দেখানো হয়েছে । পাহাড় পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতাও পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

পঞ্চম অধ্যায়ে একইভাবে রবী-দ্রনাথের কাশ্মীর ভ্রমণ এবং রবী-দ্র সাহিত্যে তার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে । কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগরে অবস্থানকালে রবী-দ্রনাথ কি কি রচনা করেছেন এবং ঐ সকল রচনায় ওখানকার পারিপার্শ্বিকতা কেমনভাবে পড়েছে, তা আলোচিত হয়েছে ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, রবীন্দ্র-জীবনে পার্বত্য ভ্রমণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমগ্র জীবন ধরে বিচিত্র পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেও বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বিভিন্ন স্থানে নির্জন পাহাড়, পরিবেশের সন্ধান করেছেন। বর্তমান গবেষণায় পার্বত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছি এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র সৃষ্টির পর্যালোচনা করেছি।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. জীবনস্মৃতি — ঘর ও বাহির -রবী-দ্ররচনাবলী -দশম খ-ড- জ-মশতবার্ষিক সং - পৃ: ১২

২. অদেব — পৃ: ১৪

৩. ভানুসিংহের পদাবলী — পত্র সংখ্যা ১২ পৃ: ২৭৬ রবী-দ্ররচনাবলী- একাদশ খ-ড জ-মশতবার্ষিক সং

৪. রবী-দ্র স্মরণী — প্রমথনাথ বিশী -মিত্র ও ঘোষ , কলিকাতা-১২ দ্বিতীয় মুদ্রণ -পৃ: ৫

৫. জীবনস্মৃতি — ঘর ও বাহির-রবী-দ্ররচনাবলী-দশম খ-ড জ-মশতবার্ষিক সং - পৃ: ১১

৬. জীবনস্মৃতি — বাহিরে যাত্র -রবী-দ্ররচনাবলী দশমখ-ড- জ-মশতবার্ষিক-সং -পৃ: ২৪

৭. জীবনস্মৃতি — প্রভাতসংগীত -রবী-দ্ররচনাবলী দশম খ-ড- জ-মশতবার্ষিক সং - পৃ: ১০৪

৮. জীবনস্মৃতি — ঘর ও বাহির -রবী-দ্ররচনাবলী দশম খ-ড জ-মশতবার্ষিক সং - পৃ: ১১ ।

৯. জীবনস্মৃতি — হিমালয় যাত্রা -রবী-দ্ররচনাবলী -দশম খ-ড , জ-মশতবার্ষিক সং - পৃ: ৪০

১০. অদেব — পৃ: ৪৫

১১. জীবনস্মৃতি — প্রত্যাবর্তন -রবী-দ্ররচনাবলী -দশম খ-ড , জ-মশতবার্ষিক এং - পৃ: ৫০

১২. ছিন্নপত্রাবলী — পত্র সংখ্যা ২২০ পৃ: ২৩৪ রবী-দ্ররচনাবলী -একাদশ খ-ড -জ-মশত বার্ষিক সং

১৩. ঐদেব — পত্র সংখ্যা ২২১ পৃ: ২৩৫

১৪. বউঠাকুরানীর হাট—রবী-দ্ররচনাবলী অষ্টম খ-ড জ-মশতবার্ষিক সং পৃ: ৭১

১৫. ঐদেব — পৃ: ১০০

১৬. রাজর্ষি — রবী-দ্ররচনাবলী অষ্টম খ-ড জ-ম শতবার্ষিক সং —পৃ: ১১৬

১৭. বউঠাকুরানীর হাট — রবী-দ্ররচনাবলী -অষ্টম খ-ড , জ-মশতবার্ষিক সং -পৃ: ১০৮

১৮. উপনিষৎ গ্র-হাবলী — দ্বিতীয় ভাগ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ স্বামী গম্ভীরান-দ গম্পাদিত —উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা - সপ্তম সং ১৩৮৩ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ চতুর্থাধ্যায়, নবম খ-ড , শ্লোক ২)